যক্ষ্মা নির্মূলে চাই সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা

ডা. এম মামুন

আজ ২৪ মার্চ 'বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস' দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'The Clock is Ticking', যক্ষ্মা রোগের ক্ষতিকর দিক বিশেষ করে স্বাস্থ্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিণতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং রোগটি নিমূর্লে সারাবিশ্বে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।

১৮৮২ সালের এ দিনে ড. রবার্ট কোচ যক্ষ্মার জীবাণু আবিষ্কার, রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ের পথ উন্মোচন করেন। তাকে স্মরণ করেই এই দিনটিতে যক্ষ্মা দিবস পালিত হয়ে থাকে। সুদীর্ঘকাল ধরে যক্ষ্মা বিশ্বব্যাপী অন্যতম প্রধান সংক্রামক রোগের স্থান দখল করে রেখেছে। এ রোগে বিশ্বে প্রতি বছর লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু ঘটে। বিশেষ করে দারিদ্র্য এবং ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোতে এর প্রকোপ সবচেয়ে বেশি।

২০১৮ সালে সেপ্টেম্বর থেকে জাতিসংঘের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে যক্ষ্মা রোগ নির্মূলে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ একমত হন। দিবসটি উপলক্ষ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সরকার, সুশীল সমাজ, বিভিন্ন সংস্থা, স্বাস্থ্য সেবা দেওয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে যক্ষ্মা রোগী খুঁজে সবাইকে চিকিৎসা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

একটা সময় বলা হতো 'যার হয় যক্ষ্মা, তার নাই রক্ষা' তবে এখন ধারণাটি অনেক বদলেছে। এরপরও যক্ষ্মা হচ্ছে। কারণ টিবি বা যক্ষ্মা একটি মারাত্মক সংক্রামক ছোঁয়াচে রোগ। যা প্রধানত ফুসফুসকে আক্রান্ত করে। যক্ষ্মা বলতে সাধারণভাবে আমরা ফুসফুসের যক্ষ্মাকেই বুঝি। এই রোগ Mycobacterium tuberculosis (MTB) এর মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে ফুসফুসকে আক্রান্ত করে মানব শরীরে ছাড়ায়। তবে ফুসফুস ছাড়াও শরীরের বিভিন্ন স্থানে যক্ষ্মা হতে পারে। যেমন- লসিকাগ্রন্থি, হাড় ও গিট, অন্ত্র, হৃদপিন্ডের আবরণ ও মস্তিষ্কের আবরণ, লিভারে এমনকি পাকস্থলিতেও হতে পারে। বিশ্বে টিবি সংক্রমণে মানুষের মৃত্যুর হার দ্বিতীয় স্থানে। যক্ষ্মা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রচলিত রোগ। এর মধ্যে ২২টি দেশ ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকায় রয়েছে।

যক্ষ্মা এমন একটি রোগ যেটা হাঁচি, কাশি ইত্যাদির মাধ্যমে ছড়ায়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিটি পরিবারে অনেক লোক একসঙ্গে বসবাস করে। একজন আক্রান্ত হলে পরিবারের অন্যান্য লোকও আক্রান্ত হতে পারে, আর সেই জন্যই প্রতি বছর যক্ষ্মা বা টিবির নতুন নতুন রোগী তৈরি হচ্ছে।

সাধারণভাবে বলা যায় যক্ষ্মা বা টিবি রোগের প্রধান লক্ষণগুলো হলো- সাধারণত তিন সপ্তাহের বেশি সময় ধরে কাশি ও জ্বর; কাশির সঙ্গে কফ এবং রক্ত আসা; বুকব্যাথা অথবা শ্বাস নেয়ার সময় অথবা কাশির সময় ব্যথা হওয়া; ওজন কমে যাওয়া; শারীরিক দুর্বলতা ক্ষুধামন্দা বা খাদ্যে অরুচি, অবসাদ অনুভব করা ইত্যাদি। শরীরের যে অংশে যক্ষ্মার জীবাণু সংক্রমিত হবে সেই অংশটি ফুলে উঠবে। যেমন- গলার গ্লান্ড আক্রান্ত হলে গলা ফুলবে, মেরুদন্ড আক্রান্ত হলে পুরো মেরুদন্ড ফুলে উঠবে। ফোলা অংশটি খুব শক্ত বা একদম পানি পানি হবে না, সেমি সলিড হবে। ফোলার আকার বেশি হলে ব্যথাও হতে পারে। লিভারে যক্ষ্মা হলে পেটে পানি চলে আসে। তাই পেটও অস্বাভাবিক ফুলে যায়। মস্তিষ্কে সংক্রমিত হলে সেখানেও পানির মাত্রা বেড়ে যায়। এছাড়াও চামড়ায় বা অন্য যেখানেই হোক না কেন সেই অংশটা ফুলে ওঠে।

লক্ষ্যণীয় যে যক্ষ্মা এবং কোভিড-১৯ রোগের লক্ষণে যথেষ্ট মিল রয়েছে। তাছাড়া রোগ ছড়ানোর উপায়ও প্রায় একই ধরনের। দুটি রোগের ক্ষেত্রেই ফুসফুসের সংক্রমণ ঘটে থাকে। তাই এই সময়ে কারও যদি দুই সপ্তাহ ধরে কাঁশির লক্ষণ দেখা দেয় তাহলে অবশ্যই যক্ষ্মার পরীক্ষা করাতে হবে।

দেশের মোট জনসংখ্যার একটি অংশ জন্মগতভাবেই যক্ষ্মা রোগের জীবাণু বহন করে থাকে। তবে শরীরে জীবাণু থাকা মানেই এই নয় যে ব্যক্তি রোগে আক্রান্ত। তবে জীবাণুর ধারক নিজে আক্রান্ত না হলেও তার মাধ্যমে অন্যের শরীরে যক্ষ্মা ছড়াতে পারে। আর সেটা যেকোনো অঙ্গেই হতে পারে। আর এই জীবাণু থেকে তাদেরই রোগ হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগী এবং এইচআইভি আক্রান্ত রোগীদের এই জীবাণুতে সংক্রমণের ঝুঁকি অনেক বেশি থাকে। দেখা গেছে, আফ্রিকা বিশেষ করে পশ্চিম আফ্রিকা, আফগানিস্তান, চীন, রাশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, উত্তর আমেরিকা, পাকিস্তান ভারত ও বাংলাদেশের মানুষের মাঝে যক্ষ্মার প্রকোপ বেশি।

সাধারণত যক্ষ্মা বা টিবি দুই ধরনের হয়ে থাকে, ফুসফুসে যক্ষ্মা ও ফুসফুসবহির্ভূত যক্ষ্মা। এর মধ্যে ৮৫ শতাংশ হলো ফুসফুসের যক্ষ্মা আর ১৫ শতাংশ অন্যান্য যক্ষ্মা। সাধারণত ১৫ থেকে ৪০ বছর বয়সের লোকেরা বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে। সারা বিশ্বের দশটি মৃত্যুজনিত কারণের মধ্যে যক্ষ্মা অন্যতম। আর বিশ্বের এক চতুর্থাংশ মানুষের দেহে এই রোগ সুপ্ত অবস্থায় আছে, যা সাধারণত সংক্রমণ ঘটায় না, তবে এদের মধ্যে পাঁচ থেকে পনেরো ভাগ মানুষের জীবনে যক্ষ্মার সংক্রমণ হতে পারে।

তবে এই রোগ নিয়মিত চিকিৎসায় সম্পূর্ণ নির্মূল করা সম্ভব। যক্ষ্মা রোগীর প্লেট, গ্লাস, বিছানা আলাদা করে দেওয়ার দরকার নেই। কারণ বাতাসের মাধ্যমে যক্ষ্মা রোগের জীবানু ছাড়ায়। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি বা কাশির মাধ্যমে ছড়ায়, তাই যার এ রোগ রয়েছে তাকে কিছু বিষয়ে সর্তক হতে হবে। হাঁচি বা কাশির সময় মুখে রুমাল দেওয়া, হাত দিয়ে মুখ ঢাকা অথবা এক দিকে সরে কাশি দিতে হবে। যেখানে সেখানে কফ বা থুতু ফেলা যাবে না। আক্রান্ত ব্যক্তির মুখের কাছাকাছি গিয়ে কথা বললে এ রোগের জীবাণু ছড়াতে পারে। রোগীর কফ বা থুতু নির্দিষ্ট পাত্রে ফেলে তা মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার কারণে যক্ষ্মার জীবাণু ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হলে যক্ষার জীবাণু ফুসফুসে এবং শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে যেতে পারে এবং তা রোগ প্রতিরোধী কোষগুলো ধ্বংস করে দিতে পারে। বছরের পর বছর ধরে যক্ষ্মার জীবাণু শরীরে থাকলে পরবর্তীতে এটি সক্রিয় যক্ষ্মার রূপ নিতে পারে। সাধারণত বয়স, ঔষধ সেবন, অপুষ্টি, কেমোথেরাপী, মদপান ইত্যাদির জন্য রোগ প্রতিরোধ কমে গেলে সক্রিয় যক্ষ্মা হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে।

যক্ষ্মা শনাক্ত হওয়ার পর নিয়ম মেনে পূর্ণাঙ্গ ডোজ ঔষুধ সেবন করতে হয় যক্ষ্মা রোগীকে। কিন্তু কিছুদিন ঔষুধ সেবনের পর কিছুটা ভালো মনে হলেই ঔষধ বন্ধ করে দেন রোগীরা। অনেক রোগী পূর্ণাঙ্গ ডোজ আর শেষ করেন না। এতে করে ঐ রোগীর নরমাল যক্ষ্মা থেকে ঔষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মার আক্রান্তের আশঙ্কা দেখা দেয়। অর্থাৎ আগের নরমাল ঔষধগুলো ঐ রোগীর শরীরে আর কাজ করেনা । যার কারণে আরো দামি ঔষুধের পাশাপাশি উচ্চ দামের ইনজেকশন দিতে হয় ডিআর যক্ষ্মা রোগীকে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে প্রতি বছর বাংলাদেশে প্রায় ছয় হাজার যক্ষ্মা রোগী মারা যাচ্ছে। গ্লোবালটিবি রির্পোট ২০২০ শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে মোট ২ লাখ ৯২ হাজার ৯৪২ জন যক্ষ্মারোগী শনাক্ত হয়েছে। সে হিসেবে প্রতি লাখে ২২১ জন নতুন এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং প্রতি লাখে ২৪ জন মৃত্যুবরণ করে। এতে বলা হয় যক্ষ্মা চিকিৎসার আওতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে আগের তুলনায় এগিয়েছে বাংলাদেশ। ২০১৯ সালে দেশে যক্ষ্মা চিকিৎসার আওতায় রোগীর হার ছিল ৮৫ শতাংশ। ২০২২ সাল নাগাদ এটিকে ৯০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য রয়েছে। এছাড়া দেশে ৯৬ শতাংশ ক্ষেত্রেই যক্ষ্মার চিকিৎসার সাফল্য মিলেছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

বাংলাদেশের সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা সদর হাসপাতাল বক্ষব্যাধি ক্লিনিক হাসপাতাল, নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র, এনজিও ক্লিনিক ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহে বিনামূল্যে কফ পরীক্ষা, রোগ নির্ণয়সহ যক্ষ্মার চিকিৎসা করা হয় ও ঔষধ দেওয়া হয়। যক্ষ্মা হলে ত্বকের পরীক্ষা, রক্তের পরীক্ষা, কফ পরীক্ষা, বুকের এক্স-রে অথবা সিটি স্ক্যান এবং কালচার টেস্টও করানো হয়ে থাকে।

যক্ষ্মা নিরাময়ে নিয়মিত ওষুধ সেবনের পাশাপাশি রোগীর খাদ্যাভ্যাসের দিকটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। যক্ষ্মারোগীর খাদ্য তালিকায় অবশ্যই পর্যাপ্ত পরিমাণ শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট থাকতে হবে। কোনোভাবেই লো-কার্ব ডায়েট দেওয়া ঠিক হবে না। প্রধান খাবার হতে পারে লাল চালের ভাত, রুটি, খিচুড়ি, হালুয়া প্রভুতি। এছাড়াও আমিষ বা প্রোটি, ভিটামিন, মিনারেলস আয়রন ও জিংক সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে।

সরকার প্রতিটি নাগরিকের স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নে বদ্ধপরিকর। স্বাস্থ্যখাতে সমতা আনতে কাজ করে যাচ্ছে সরকার। সরকার বিনামূল্যে যক্ষ্মা রোগীদের ওষুধ দিচ্ছেন। এ ছাড়াও মারণব্যাধি যক্ষ্মা নির্ণয়ে নামনো হয়েছে উন্নত প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি সংযোজিত ভ্রাম্যমান গাড়ি। সরকার বাংলাদেশে যক্ষ্মার ওষুধ তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

সর্বোপরি একটা কথা বলা যায়, অতীতে মানুষের যক্ষ্মা ধরা পড়লে হতাশ হয়ে জীবন যাপন করতে হতো। কারণ তখন যক্ষ্মার কোনো ঔষধ ছিলনা। ফলে মানুষ খুবই ভয় পেত। আজ আর সেই দিন নেই। যক্ষ্মার ওষুধ নিয়মিত সেবন করলে এবং সঠিক নিয়মে খাদ্যবিধি মেনে চললে যক্ষ্মা সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা সম্ভব।

#

২১.০৩.২০২১ পিআইডি ফিচার